দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 APR 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 1

প্রতিভা ও শিক্ষকতা ঃ প্রসঙ্গ কথা

জয়নাল আবেদীন

কোন কিছুরই নিজস্ব সংজ্ঞা নেই। যে কোন কিছুর আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যই তাকে সংজ্ঞায়িত করে। প্রতিভা প্রকৃতি প্রদত্ত। মানুষ সৃষ্টির সেরা। আর প্রতিভা মানুষকে দেয় আজকের শ্রেষ্ঠ অবদানগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। প্রতিভা বলেই মানুষ তার প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করে আপন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। পশুসুলভ জীবন থেকে সভ্যতার সোনালী যুগে মানুষের এই যে পদার্পণ তার নেপথ্য শক্তি হলো প্রতিভা। সাধারণ প্রতিভা সব মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এবং তা স্বভাবগতভাবে বিকশিত হয়। বিশেষ প্রতিভা বিরল। তা সুপ্ত থাকে এবং কেবল সুযোগ ও পরিবেশ পেলেই বিকশিত হয়। জ্ঞানই যদি শক্তি হয়, তবে প্রতিভা সে জ্ঞানের উৎস। বস্তুতঃ প্রতিভাই মানুষকে গুহার কুটুরী থেকে বর্তমান পারমাণবিক যুগে নিয়ে এসেছে। আমাদের চলমান সমাজের বাস্তবতার নিরিখে অপাংতেয় বলে মনীষীরা শিক্ষক বা শিক্ষকতা প্রসঙ্গে যে সব সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে সেগুলোর উদ্ধৃতি দেয়া হয়নি। সুধী পাঠকদের অনেকেই সে সব সংজ্ঞার সাথে কম-বেশী পরিচিত। তাছাড়া বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ পাঠান্তে আমাদের শিক্ষকদের অবস্থান ও শিক্ষকতার বৈশিষ্ট্য অবলোকন করে পাঠক নিজেই এর চলমান সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস আছে। তথাপি আলোচনার সূচনায় জনৈক মনীষীর মন্তব্য এখানে বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষী মহান রাসেল শিক্ষকদের 'সভ্যতার অভিভাবক' বলে অভিহিত করেছেন। তার এ মন্তব্য এত স্পষ্ট ও চিরন্তন যে, এর বাড়তি ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ শিক্ষকরা পরোক্ষভাবে দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। জাতীয় জীবনের যে কোন শাখার প্রতি আপনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই সর্বত্রই দেখবেন শিক্ষকদের আদর-সোহাগ বা আপাতঃ ভর্ৎসনায় গড়ে উঠা সন্তানরা ছড়িয়ে আছে।

জাতিকে যদি একজন মানুষ হিসেবে কল্পনা করা যায়, তবে শিক্ষক হলেন তার হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ড সচ্চসথ আর কার্যক্ষম থাকলেই পুরো মানুষ সবল, স্বচ্ছন্দ থাকে। প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষক হলেন একটি জাতির নিরোগ হৃৎপিণ্ডের মত। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হলে যেমন আমাদের দেহ অকেজো আর প্রাণহীন জড় পদার্থে পরিণত হয়, তেমনি সুনিপুণ শিক্ষকের অভাব হলে একটি জাতিও ধীরে ধীরে সভ্য জগতের প্রতিযোগিতাময় ময়দান থেকে ছিটকে পড়ে, তথা বিলীন হয়ে যায়। যে গ্রীক জাতির নিকট আজকের সভ্যতা অনেকখানি ঋণী, তার জ্ঞানগরিমার মূলে রয়েছে সক্রেটিস, প্ল্যাটো, এ্যারিস্টটলের মত প্রতিভাবান শিক্ষকদের অবিনশ্বর অবদান। সক্রেটিস, প্ল্যাটো, এ্যারিস্টটলরা শুধু গ্রীক সভ্যতার নয়, সমগ্র মানব সভ্যতার অভিভাবক, ধারক ও বাহক। আর প্রতিভা হলো এর নেপথ্য চালিকা শক্তি।

যেহেতু শিক্ষকরা জ্ঞানের অনির্বাণ মশাল জাতীয় জীবনের সর্বত্রই ছড়িয়ে দেন অকৃত্রিমভাবে, সেহেতু শিক্ষকদের প্রতিভা যত তীক্ষ্ণ এবং জ্ঞানের পরিসর যত গভীর হবে, জ্ঞানের দেদীপ্যমান শিখা তত উজ্জ্বলতর হয়ে জাতীয় জীবনের সর্বত্রই প্রতিফলিত হবে। তাই জাতির কারিগর হিসেবে যারা শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত হবেন, তাদের বিচার বুদ্ধি, আচরণ আর ব্যবহার সর্বোপরি প্রতিভা আদর্শস্থানীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতিভাবানরা যদি শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তবে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বর্তমানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দক্ষ প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, প্রকৌশলী, স্থপতি, চিকিৎসক তথা কর্মী উপহার দেয়া সম্ভব হবে—যাদের অভাবে জাতীয় উন্নয়ন নানাভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

আমাদের দেশে শিক্ষকতার পেশায় কোন শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্নরা আসছেন? অনেকে মনে করে থাকেন যে, যারা পাঠান্তে অন্য কোন পেশায় প্রবেশের সুযোগ লাভে ব্যর্থ হয়েছেন, তারাই শিক্ষকতায় আসছেন। এ ধারণা যেমন পুরোপুরি মিথ্যে নয়, তেমনি পুরো সত্যিও নয়। অনেকে অন্যত্র ভাল সুযোগ উপেক্ষা করে নেশা হিসেবে এ পেশায় প্রবেশ করেছেন সহজ-সরল জীবনযাপনের প্রত্যাশায়। তথাপি দু'চার জনের কথা বাদ দিলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইদানীং প্রতিভাবানরা মোটামুটিভাবে এ পেশায় প্রবেশ করছে না। প্রবেশিকা পরীক্ষার মেধা তালিকায় যারা নাম লিখবার অনন্য গৌরব অর্জন করে শুধু তারাই নয়, যারা কোন রকমে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়—সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবার স্বপ্ন দেখে। চিকিৎসা বা প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হবার সুযোগ পায় না, তারাও ডিগ্রী নিয়ে অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত হবার চেষ্টা করে। ফলে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৃত মেধাবীদের শিক্ষক হিসেবে পায় না।

অথচ এমন এক যুগ ছিল যখন ভাল ছাত্ররাই শিক্ষকতার পেশায় প্রবেশ করত। সাধারণ মেধাসম্পন্নরা তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে এ পেশা গ্রহণের সাহস পেত না। অথচ আজকের দিনে অবস্থার আমুল পরিবর্তন ঘটেছে। আমার ছাত্রদের মাঝে মৌখিক জরিপ চালিয়ে দেখলাম, তাদের কেউই শিক্ষক হতে প্রস্তুত নয়। অভিভাবকরা চান না, তাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষকতার পেশায় প্রবেশ করুক।

আমরা যারা শিক্ষক এবং যাদের মেধাবী সন্তান রয়েছে তারাও কামনা করেন না যে, তাঁদের সন্তানরা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করুক।

শিক্ষকতাকে সবাই এক বাক্যে সম্মানীয় ও মহান পেশা বলে স্বীকার করার পরও শিক্ষকতার পেশা গ্রহণে এ গণঅনীহা কেন? এর সংক্ষিপ্ত উত্তরে বলা যায়, আমাদের সমাজ এ পেশাকে মৌখিকভাবে মর্যাদাশীল বলে স্বীকৃতি দিয়েছে মাত্র। কিন্তু বাস্তবে এ পেশায় নিয়োজিতরা আধুনিক আর্থ-বাণিজ্যিক সভ্যতার যুগে বলতে গেলে অসহায়ভাবে জীবনযাপন করছেন। এ পেশার প্রতি সমাজের বাস্তব শ্রদ্ধা নেই বলেই সমাজ প্রতিনিধিরা তাদের মেধাবী সন্তানদের এ পেশায় প্রেরণ করছেন না। বিবিধ উৎস থেকে অর্থ আয়ের প্রশস্ত পথ এ পেশায় নেই। এ পেশায় নিয়োজিতরা সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে সর্বনিম্ন সম্মানী পেয়ে থাকেন। এমনটা, আমাদের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরাই শিক্ষকদের জন্য করে রেখেছেন। এ যান্ত্রিকতার যুগে সমাজের একটা ব্যাপক অংশ যেখানে বিশ্বাস করে, "Money, money, money; brighter than sunshine, sweeter than honey"—সেখানে নিশ্চিত আর্থিক সুবিধাহীন পেশায় মেধাবীরা প্রবেশ করবে কেন?

অনেক শিক্ষক মনে করেন, শিক্ষকদের করুণ অবস্থা দেখে অভিভাবক/শিক্ষার্থীরা শিক্ষকতার প্রতি উৎসাহী নন। প্রাতঃকালে যখন অন্য পেশার লোকেরা বিছানা ত্যাগ করেন না, সে সাত সকালে কোন কোন শিক্ষককে অন্যের দরজায় টোকা দিতে হয়। আবার রাত দশটায় যখন সবাই আরামময় ঘুমের রাজ্যে যাত্রার আয়োজন শেষ করেন, তখনও শিক্ষককে অন্যের দরজায় করাঘাত করতে হয়। এমন একদিন ছিল যখন শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে ধর্ণা দিত জ্ঞানের অন্বেষায়—এখন যুগের হাওয়া উল্টে যাওয়ায় শিক্ষককে ধর্ণা দিতে হয় শিক্ষার্থীর গৃহে অর্থ উপার্জনের তাগিদে। অর্থের লোভে নয়—অস্তিত্ব রক্ষার তাড়নায় একজন শিক্ষককে এভাবে সকাল ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ের বাইরে একটানা পরিশ্রম করতে হয়। তারপরও কি তারা স্বচ্ছলতার মুখ দেখেন? সুখ-শান্তি, প্রাচুর্য তাদের নিকট সোনার পাথর বাটি, হয়ত অন্য গ্রহের অচেনা বাসিন্দা। সুখ যেন সোনার হরিণ—যার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায় না। এই করুণ আর অসহনীয় অবস্থা অবলোকন করেই আমাদের মেধাবীরা এ অনিশ্চিত পেশায় আসছে না।

যতদিন শিক্ষকতার পেশায় আর্থিক দৈন্য থাকবে, ততদিন তারা শুধু অসহনীয় যন্ত্রণাই সহ্য করবে না, বরং সমাজেও তাদের বাস্তব সম্মান জানাবে না। শিক্ষকতাকে অভিভাবক তথা শিক্ষর্থীর নিকট আকর্ষণীয় ও মর্যাদাসম্পন্নন করতে পারলেই এখানে মেধাবী ছাত্ররা আসবে। চিকিৎসক, প্রকৌশলী বা অন্যান্য লোভনীয় পেশায় প্রবেশের মূল কারণ হলো স্বচ্ছল তথা বিলাসী জীবনযাপনের নিশ্চয়তা, যেহেতু আমাদের সমাজে আর্থিক স্বচ্ছলতা সামাজিক মর্যাদার পূর্বশর্ত, সেহেতু শিক্ষকতার পেশাকে আর্থিক দিক থেকে লোভনীয় করে তুললে মেধাবীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এ পেশায় প্রবেশ করবে। আমাদের কয়েকজন শিক্ষক বন্ধু স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষকতায় প্রবেশ করেও আর্থিক দৈন্য ও সামাজিক অপাংতেয়তার কারণে শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে নিম্নস্তরের চাকরি নিয়েছেন। বলা বাহুল্য, সৌদিয়া'য় আরোহণের সাথে সাথে এতদিনের অবহেলিত শিক্ষকদের সামাজিক ভ্যালু হু হু করে বেড়ে যায়। আমাদের সমাজ কতটুকু কমার্শিয়াল মানসিকতা সম্পন্ন উপরোক্ত উদাহরণ তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এ জন্য শিক্ষকতার পেশায় প্রবেশের কোন উৎসাহই আমাদের সমাজ দেয় না; বরং এ মহান পেশা ত্যাগের ইন্ধনই আমরা প্রতিনিয়ত পেয়ে থাকি। তাই সুযোগ পেলেই অনেক শিক্ষক এ পেশা ছেড়ে দেয়।

শিক্ষতার প্রতি এ অনীহা এবং শিক্ষকদের নিরাপত্তাহীনতা জাতির জন্য শুধু দুর্ভাগ্যজনকই নয়, বরং জাতীয় অস্তিত্বের প্রতি চরম হুমকিস্বরূপ। শিক্ষকদের অবহেলিত রেখে জাতিকে গৌরবান্বিত করা যাবে না।

জাতিকে সুন্দর ও দক্ষ নাগরিক উপহার দিতে হলে মানুষ গড়ার কারখানায় সুনিপুণ কারিগর নিয়োগ করতে হবে। চিকিৎসক, প্রকৌশলী হবার জন্য মেধার প্রয়োজন। কিন্তু সে মেধার যথাযথ বিকাশ ঘটানো এবং এর ভিত্তিকে মজবুত করতে হলে অধিক মেধাসম্পন্নদের শিক্ষকতার পেশায় নিয়োগ করতে হবে। একজন প্রথম শ্রেণীর মেধা সম্পন্ন শিক্ষকই প্রথম শ্রেণীর ছাত্র তৈরী করতে পারেন। তার সংস্পর্শে এসে সাধারণ মেধা সম্পন্নরাও বুৎপত্তি প্রদর্শন করতে পারে।

স্বচ্ছলতা তথা বিলাসী জীবনের প্রত্যাশায় বিভোর মেধাবী ছাত্ররা যখন এ পেশায় আসছে না, তখন এ পেশাকে লোভনীয় ও মর্যাদাশীল করতে হবে। এ জন্য রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সমাজ থেকেই এ সচেতনতা জাগ্রত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেদিন এ জাতির মেধামুক্তি ঘটবে এবং প্রতিভাবানরা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে শিক্ষকতার মহান পেশা গ্রহণে এগিয়ে আসবে, সেদিন হয়ত আমরা অন্য জগতের বাসিন্দা হয়ে যাব—।

তথাপি মানুষের আত্মা যদি অমর হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই প্রশান্তি পাব এই ভেবে যে, সোনার দেশ গড়ার মহান কাজে সোনার ছেলেরা শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। যত শীঘ্র এ পরিবর্তন আসবে, জাতির জন্য তা ততই কল্যাণকর হবে।

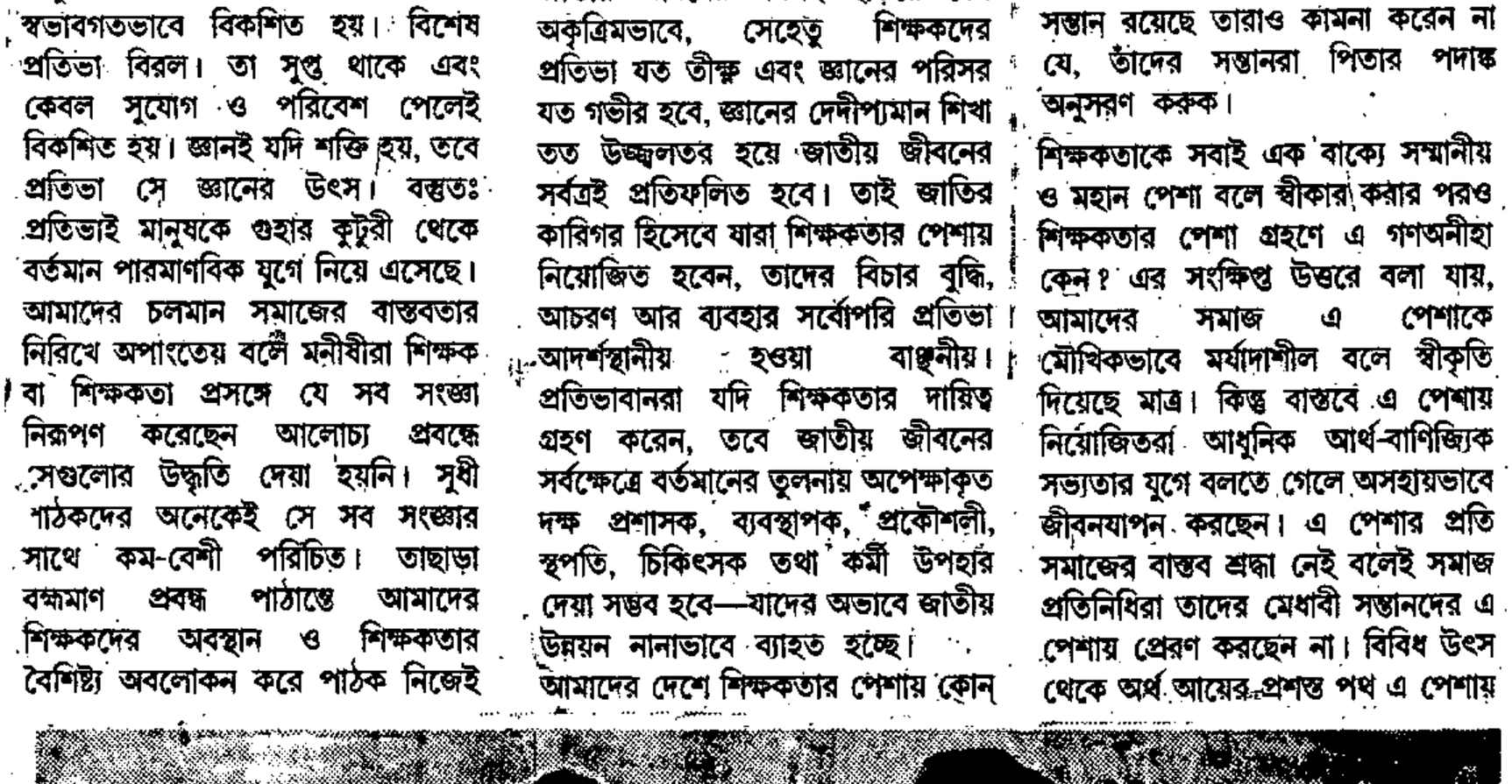

যে কোনো পরীক্ষার ফল বের হলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন দৃশ্য দেখা যায়